بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ জুলাই, ২০২৫ মোতাবেক ১১ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

যেমনটি গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল, কা'বার চাবি ছিল উসমান বিন তালহার কাছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে (বা) যখন মক্কা বিজয় হয়েছিল, তখন হযরত আলী (রা.) 'সিকায়াহ্' তথা (হাজীদের) পানি পান করানোর সম্মানের পাশাপাশি চাবি রক্ষণাবেক্ষণের সম্মান লাভ করার জন্যও আবেদন করেন; অর্থাৎ চাবি যেন তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু মহানবী (সা.) কা'বা ঘর থেকে বের হবার সময় উসমান বিন তালহাকে ডাকেন আর তার কাছে চাবি ফেরত দিয়ে বলেন, اَلْيَوْمُ يَوْمُ بِرٍّ وَوَفَاءٍ অর্থাৎ আজ সদাচার এবং অঙ্গীকার পূরণের দিন। সে সময়ে উসমান বিন তালহা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। একথা বলার বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) হিজরতের পূর্বে একবার উসমান বিন তালহার কাছে কা'বার চাবি চেয়েছিলেন। তখন সে উত্তরে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করেছিল এবং চরম নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছিল। মহানবী (সা.) তখন অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেন এবং বলেন,

يَا عُثْمَانُ، لَعَلَّكَ سَتَرَىٰ هٰذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِي، أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ অর্থাৎ, **'হে উসমান! স্মরণ রেখো, এই চাবি একদিন না একদিন আমার হাতে আসবে আর সেদিন আমি যাকে চাইব তা প্রদান করব'**। উসমান তখন উত্তরে বলেছিল, যদি এমন সময় আসে তাহলে তা হবে কুরাইশের ধ্বংস ও লাঞ্ছনার সময়। তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, عَمَرَتْ وَعَزَّتْ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ, **এমনটি নয়, বরং তা হবে কুরাইশের সমৃদ্ধি ও সম্মান-মর্যাদার সময়**।

এসব যুলুম-অত্যাচার যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি করা হয়েছিল (তা) তখন তাঁর স্মরণে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) সেসব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে উসমান বিন তালহা স্বয়ং বর্ণনা করেন, অজ্ঞতার যুগে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমরা কা'বা ঘর খুলতাম। একদিন মহানবী (সা.) আসেন এবং কিছু মানুষের সাথে কা'বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে চান। তখন আমি তাঁর সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলি। কিন্তু তিনি (সা.) অত্যন্ত কোমলতার সাথে উত্তর দেন এবং বলেন, **হে উসমান! একদিন তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখবে। আর আমি যাকে চাইব এটি দিয়ে দেবো**। আজ যখন সেই দিনটি এসে গেল, এসব ঘটনা হয়ত উসমানেরও মনে পড়ছিল আর মহানবী (সা.)-ও সেই দিনটি ভুলে যান নি। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, হে উসমান! তোমার চাবি সামলে রাখো। এসব সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাকে একথাই বলেন, এই নাও, আজ আমি তোমাকে চাবি দিচ্ছি। আজ সদাচার এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার দিন। এই চাবি চিরকালের জন্য নিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে কেবল (কোনো) অত্যাচারীই এটি কেড়ে নেবে। আর এটি তোমার বংশেই থাকবে। আজ পর্যন্ত কা'বা ঘরের চাবি বংশানুক্রমে এই পরিবারের কাছেই রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন বনু খুযাআ' গোত্র বনু হুযাইল গোত্রের এক মুশরিককে হত্যা করে। তখন মহানবী (সা.) যোহরের পর বক্তব্য দেবার জন্য দাঁড়ান। মহানবী (সা.) তাঁর কটিদেশ কা'বার সাথে লাগিয়ে, সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ছিলেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি তাঁর উটের ওপরে

আরোহণ করা অবস্থায় ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করেন আর বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লা সেই দিন থেকে মক্কাকে হারাম তথা পবিত্র করেছেন যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর যেদিন তিনি সূর্য ও চাঁদ বানিয়েছেন আর এই দুটি পাহাড় (তথা) সাফা ও মারওয়া স্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, এটিকে মানুষ পবিত্র বানায় নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা বানিয়েছেন। এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত হারাম বা পবিত্র থাকবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য এতে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়, কিংবা এর বৃক্ষ কর্তন করাও বৈধ নয়। এটি আমার পূর্বেও কারো জন্য হালাল বা বৈধ ছিল, আর আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আমার ক্ষেত্রে এটি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য হালাল হয়েছিল, আর এর পবিত্রতা আবার সেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যেমনটি গতকালও ছিল। তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (এ কথা) পৌঁছে দেয়। তোমাদেরকে যে বলবে, মহানবী (সা.) এতে যুদ্ধ করেছিলেন– তাকে বলে দিও, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলের জন্য এটা হালাল করেছিলেন, কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য তা হালাল করেন নি। হে লোকসকল! মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সবচেয়ে বেশি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী সেই ব্যক্তি, যে হারামের মধ্যে (কাউকে) হত্যা করেছে অথবা নিজের (আত্মীয়ের) হন্তারক ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করে বা অজ্ঞতার যুগের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে (কাউকে) হত্যা করে। হে বনু খুযাআ'! হত্যা করা বন্ধ করো। তোমরা একজনকে হত্যা করেছ। আমি এর রক্তপণ প্রদান করব। [মহানবী (সা.) বলেন, সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী এখন আমি এর রক্তপণ আদায় করব।] আমার জামিনদার হবার পর কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তার (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির) পরিবারের দুটি অধিকার থাকবে; (প্রথমত) তারা যদি চায় তবে রক্তপণ গ্রহণ করবে আর (দ্বিতীয়ত) যদি চায় তবে তাকে হত্যা করতে পারবে। এরপর মহানবী (সা.) যাকে খুযাআ' গোত্র হত্যা করেছিল সেই ব্যক্তির রক্তপণ হিসেবে একশ উট প্রদান করেন। তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) রক্তপণ প্রদান করেন।

সেই দিনগুলোতে **ফাযালা বিন উমায়েরের** মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার অপবিত্র ষড়যন্ত্রও প্রকাশ পায়। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে, মক্কা বিজয়ের দিন এমন অনেক মানুষও ছিল যারা ভেতরে ভেতরে অন্তর্দাহে ভুগছিল, কিন্তু তারা নিরুপায় ছিল। এ কারণেই মক্কার কতিপয় সাহসী যুবক, যেমন ইকরামা প্রমুখ, সুসংগঠিত একটি দল গঠন করে এক স্থানে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধও করেছিল। একই মনোভাবাপন্নদের একজন ছিল ফাযালা বিন উমায়ের। সে বলে, যখন মহানবী (সা.) কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন আমিও (মানুষের) ভিড়ে মিশে যাই আর মনে মনে ফন্দি আঁটছিলাম, যখনই মহানবী (সা.)-এর কাছাকাছি যাব তখন চুপিসারে নিজের খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করব, নাউযুবিল্লাহ্। সে এই দুরভিসন্ধি নিয়ে তাঁর (সা.) পিছু নেয়। যখনই সে মহানবী (সা.)-এর নিকটবর্তী হয় তখন তিনি (সা.) তাকে দেখে বলেন, তুমি কি ফাযালা? সে উত্তরে বলে, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, মনে মনে কী ভাবছ? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করছি। [সে মিথ্যা কথা বলে।] তখন মহানবী (সা.) মৃদু হেসে বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তুমি যা বলছ তা করছিলে না। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন আর তার বক্ষে হাত রাখেন। ফাযালা বর্ণনা করেন, খোদার কসম! মহানবী (সা.) তখনও আমার বক্ষ থেকে হাত সরান নি (অথচ) জগতে আমার কাছে মুহাম্মদ (সা.)-ই সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠেন। এরপর সে তার পরিবারের কাছে ফিরে যায়। (হত্যার) উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এরপর তার চেহারাই বদলে যায়। (অর্থাৎ তার মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।)

সেই দিনগুলোতে হযরত আবু বকর (রা.)-র শ্রদ্ধেয় পিতার ইসলাম গ্রহণ করার উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা.)-র পিতা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনেন নি। ততদিনে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন হারাম শরীফে প্রবেশ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার পিতাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, হে আবু বকর! তুমি এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে বাড়িতেই থাকতে দিতে। এত প্রবীণ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ! আমি নিজেই তার কাছে যেতাম। এতে হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তার কাছে যাবার চাইতে তার আপনার সমীপে উপস্থিত হওয়াটা অধিক উপযুক্ত। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি (সা.) তার বুকে হাত বোলান এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। অতএব তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-র পিতা ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

হযরত উম্মে হানী (রা.)-র ঘরে তাঁর (সা.) খাবার গ্রহণ করা সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন হযরত উম্মে হানী (রা.)-কে বলেন, তোমার কাছে কী খাবার আছে যা আমরা খেতে পারি? তিনি নিবেদন করেন, শুকনো রুটির টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই, আর সেগুলো আপনার সমীপে উপস্থাপন করতে আমার আমার লজ্জা হচ্ছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলোই নিয়ে এসো। তিনি (সা.) সেগুলো পানিতে ভিজিয়ে দেন। তিনি (রা.) লবণও নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) বলেন, কোনো ঝোল আছে কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার কাছে সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি (সা.) বলেন, সেই সিরকাই নিয়ে এসো। তিনি (সা.) সেটিকে খাবারে ঢেলে দেন এবং তা খান আর আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বলেন, সিরকা কতই উত্তম তরকারি! হে উম্মে হানী, যে বাড়িতে সিরকা থাকে, সেই বাড়ি দরিদ্র নয়। এটি কৃতজ্ঞতারও পরম উদাহরণ আর এভাবে তিনি (সা.) উম্মে হানী (রা.)-রও মনস্তুষ্টি করেন। এই হলো মক্কা বিজয়ীর অবস্থা! যেক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়ি থেকে সব কিছুই আনানো সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) শুকনো রুটির সেই ছোটো টুকরো খেয়েই সময়টি কাটিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর (সা.) মক্কায় পৌঁছানো এবং সেখানে সব কিছু, বিশেষত কা'বা ঘরকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখার ফলে আনসারের মনে আশঙ্কা জাগে, তিনি আবার সেখানেই থেকে না যান! প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে: 'ইশক আস্ত হাযার বাদগুমানি' অর্থাৎ, ভালোবাসা এক জিনিস– এর সাথে থাকে হাজারো কুধারণা ও কুমন্ত্রণা থাকে। প্রেমিক সর্বদা তার প্রিয়জনের ব্যাপারে চিন্তিত থাকে। প্রেম-ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা ও নিষ্ঠার অনেক দৃশ্য মক্কা বিজয়ের সময় দেখা গেছে। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য মদীনার আনসারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আসেন, মক্কায় প্রবেশ করেন এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে যান আর সেটিকে 'ইস্তিলাম' করেন, অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ে চড়েন, যেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখছিলেন এবং দুই হাত তুলে যতটুকু আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, সে অনুযায়ী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র যিকর করতে থাকেন এবং তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকেন। আনসার তাঁর (সা.) নীচে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি (সা.) দোয়া করেন আর আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করেন এবং ততটা দোয়া করেন যতটা আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর ব্যস্ততা এবং মক্কাবাসীদের সাথে সদাচরণের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে আনসার নিজেদের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তারা একে অপরকে বলতে থাকেন, তাঁর (সা.) ওপর নিজ মাতৃভূমির ভালোবাসা এবং

নিজ গোত্রের ভালোবাসা প্রবল হয়ে গেছে আর সম্ভবত এখন তিনি (সা.) এখানেই নিজ এলাকায় নিজের প্রিয় আত্মীয়স্বজনদের মাঝে থেকে যাবেন। আর মহানবী (সা.)-এর বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই তারা বেদনার্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আনসারের যখন এই ছিল অবস্থা, তখন মহানবী (সা.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। আর যখন ওহী হতো, তখন তা আমাদের কাছে গোপন থাকত না। যখন ওহী হতো তখন আমাদের মাঝে কেউই মহানবী (সা.)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতো না, যতক্ষণ না ওহী শেষ হয়। আর যখন ওহী শেষ হয়, তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, হে আনসারের দল! তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি একথা ভাবছো যে, এই ব্যক্তির ওপর মাতৃভূমির ভালোবাসা প্রবল হয়ে গেছে? তারা বলেন, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। তিনি বলেন, যদি এমনটিই হয়, তাহলে আমার নাম কী হবে? আমি হলাম মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে তোমাদের কাছে হিজরত করেছিলাম, এখন তোমাদের সাথেই আমার জীবন-মরণ। এতে তারা আবেগের আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর (সা.) দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যা কিছু বলেছি, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রবল ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে বিচ্ছেদের ভয়ে বলেছি। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের এই কথার সত্যায়ন করছেন এবং তোমাদের অজুহাত গ্রহণ করছেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: যখন মহানবী (সা.) কা'বা ঘর যিয়ারতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতে মগ্ন ছিলেন এবং নিজ জাতির সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করছিলেন, তখন আনসারের হৃদয় ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হচ্ছিল এবং তারা একে অপরকে ইশারায় বলছিল, হয়ত আজ আমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করছি। কারণ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) হাতে তাঁর শহর জয় করে দিয়েছেন এবং তাঁর গোত্র তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করেছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে আনসারের এসব আশঙ্কার সংবাদ প্রদান করেন। তিনি (সা.) মাথা উঠিয়ে আনসারের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আনসার! তোমরা মনে করছো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিজ শহরের ভালোবাসা কষ্ট দেবে এবং নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা তার হৃদয়ে আবেগ জাগাবে? আনসার সদস্যরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটা সত্য, আমাদের অন্তরে এমন চিন্তা এসেছিল। তিনি বলেন, তোমরা জানো, আমার নাম কী? এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল বলে পরিচিত। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব, আমি তোমাদেরকে– যারা কিনা ইসলামের দুর্বলতার যুগে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে– তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব? অতঃপর বলেন, হে আনসার! এমনটা কখনো হতে পারে না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্‌র জন্য নিজের মাতৃভূমি ছেড়েছিলাম এবং এরপর এখন আমি নিজের দেশে ফিরে আসতে পারি না। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত। মদীনার লোকেরা তাঁর (সা.) এসব কথা শুনে এবং তাঁর ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি কুধারণা করেছি। মূল বিষয় হলো, আমাদের হৃদয় এই ভাবনা সহ্য করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র রসূল আমাদেরকে ও আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে নির্দোষ মনে করেন এবং তোমাদের আন্তরিকতার সত্যায়ন করছেন। যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং মদীনার লোকদের মধ্যে এই ভালোবাসা ও প্রেমের কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন মক্কার লোকেদের চোখে

অশ্রু না ঝরে থাকলেও তাদের হৃদয় নিশ্চয় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। কারণ সেই মূল্যবান হীরা, যার চেয়ে বেশি মূল্যবান কোনো জিনিস এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি– আল্লাহ্ তা'লা তা তাদেরকে দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা সেটিকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে ফেলে দেয়। আর এখন তিনি যখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর সাহায্যে পুনরায় মক্কায় এসেছেন, তিনি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে নিজের ইচ্ছা ও খুশিতে মক্কা ছেড়ে মদীনায় ফিরে যাচ্ছেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; আবু সুফিয়ান দেখে যে, মহানবী (সা.) হেঁটে যাচ্ছেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পেছনে পেছনে চলছে। সে মনে মনে বলে, হায়, আমি যদি পুনরায় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারতাম এবং তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতাম! তিনি (সা.) আসেন, তার বুকে হাত রাখেন এবং বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পুনরায় অপমানিত করবেন। অর্থাৎ, তুমি যা ভাবছো (তা হবে না), যুদ্ধ করলে তুমি পুনরায় লাঞ্ছিত হতে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র কাছে তওবা করছি এবং আমি যা কিছু বলেছি, আল্লাহ্র কাছে তার জন্য ক্ষমা চাই। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী। তিনি বলেন, আমি তো এই কথা মনে মনে ভাবছিলাম, আমি তো কাউকেই বলি নি; অথচ আপনি সেই কথা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন!

কা'বা গৃহের ছাদ থেকে যোহরের আযান দেওয়া হয়। যখন যোহরের নামাযের সময় হয় তখন তিনি (সা.) হযরত বিলালকে (রা.) আদেশ দিলে তিনি কা'বা গৃহের ছাদে চড়ে আযান দেন। বর্ণিত আছে, তিনি (সা.) সেদিন সব নামায এক ওযুতে আদায় করেছিলেন। তাঁর (সা.) রীতি ছিল, সাধারণত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নতুন করে ওযু করে নিতেন। কিন্তু আজকে যখন সাহাবীরা তাঁকে একই ওযুতে নামায পড়তে দেখেন তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আজ সেটা করেছেন যা আপনি সচরাচর করতেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, উমর! আমি জেনেবুঝেই এটি করেছি। আলেমগণ এটা থেকে ফলাফল গ্রহণ করেছেন, তিনি (সা.) প্রয়োজনের সময় এমন করার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এই সময় তিনি (সা.) সাধারণভাবে বয়আত গ্রহণ করেন। যার বিস্তারিত বিবরণে লেখা রয়েছে, হযরত আসওয়াদ বিন খালফ বর্ণনা করেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-কে মানুষজনের বয়আত গস্খহণ করতে দেখেন। তিনি (সা.) 'কারনে মাসফালা'র কাছে বসে পড়েন যেটি মক্কার নীচু এলাকার একটি পাথর। তিনি ইসলামের নামে লোকদের বয়আত গ্রহণ করেন। ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়। তিনি তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দাস এবং রসূল– এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বয়আত গ্রহণ করেন। ইবনে জারীর তাবারীতে লেখেন, লোকেরা মক্কায় তাঁর (সা.) হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য একত্রিত হয়। তিনি (সা.) সাফা পর্বতে বসেন, হযরত উমর (রা.) নীচে ছিলেন। তিনি (সা.) এই কথার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে বয়আত গ্রহণ করছিলেন যে, সাধ্যমতো তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করবে এবং আনুগত্য করবে। পুরুষদের বয়আত গ্রহণ সম্পন্ন করে তিনি (সা.) নারীদের বয়আত গ্রহণ করেন। নারীদের মাঝে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও ছিল; সে ঘোমটা দিয়ে রেখেছিল। তার ভয় ছিল, মহানবী (সা.) হয়ত তাকে হযরত হামযা (রা.)-র সাথে কৃত আচরণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। সে আশঙ্কা করছিল, এই কারণে তাকে আটক করা হতে পারে। যখন সেসব নারী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলো তখন তিনি (সা.) এই বিষয়ের ওপর বয়আত গ্রহণ করলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, তোমরা চুরি করবে না। হিন্দ বলে ওঠে,

আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো কখনো আবু সুফিয়ানের অর্থ থেকে কিছু নিয়ে নেই। আমি জানি না, এটি আমার জন্য হালাল নাকি হারাম (বৈধ নাকি অবৈধ)। আবু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল এবং শুনছিল। সে বলে, তুমি ইতিপূর্বে যেসব অর্থ নিয়েছো সেগুলো তোমার জন্য হালাল। আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাকে ক্ষমা করুন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হিন্দকে চিনতে পেরে বলেন, তুমি কি হিন্দ বিনতে উতবা? সে উত্তর দেয়, জি হ্যাঁ; কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে সেটি ক্ষমা করে দিন। অর্থাৎ, ইসলাম এবং আপনার পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে যা কিছু আমি করেছি– সেটি ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি (সা.) অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। হিন্দ বলে ওঠে, স্বাধীন নারীও কি ব্যভিচার করে? অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না। হিন্দ বলে, আমরা শৈশবে তাদের লালন-পালন করেছি, কিন্তু বড়ো হবার পর আপনি বদর প্রান্তরে তাদের হত্যা করেছেন; দায় এখন আপনার ওপর, নতুবা তাদের ওপর। এটি শুনে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ও হযরত উমর (রা.) হেসে ওঠেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা নিজেদের রচিত মিথ্যাচার দিয়ে (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না। হিন্দ বলে, অপবাদ আরোপ করা নোংরা কাজ, আর কিছু পাপ এর চেয়েও নোংরা। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা ন্যায়সংগত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হিন্দ বিনতে উতবা বুঝতে পেরেছিল সে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত, তাই সে তার স্বামী আবু সুফিয়ানকে বলে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়আত গ্রহণ করতে চাই। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে বলে, আজ পর্যন্ত তুমি তো বিরোধিতাই করে আসছো, হঠাৎ করেই এত বড়ো পরিবর্তন কীভাবে হলো? সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ইবাদত করতে দেখেছি, আর রাতভর মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গীরা কা'বা ঘরে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ রুকুর অবস্থায় আবার কেউ সিজদাবনত অবস্থায় ইবাদতে মগ্ন ছিল। এভাবে ইবাদত করতে আমি আজ পর্যন্ত অন্য কাউকে দেখি নি। তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলে, নিজ জাতির কারো সাথে যেয়ো। [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলে নিজ জাতির কাউকে নিয়ে যেয়ো।] তাই সে হযরত উমর (রা.)-র কাছে যায় এবং তাঁকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় আর নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে। ইসলাম গ্রহণের পর সে তার বাড়িতে যায় এবং যে মূর্তিগুলো তার বাড়িতে রাখা ছিল সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আর এই কথা বলতে থাকে, তোদের জন্য আমরা ধোঁকায় পড়ে ছিলাম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'লার যিনি তাঁর এই ধর্মকে বিজয়ী করেছেন, যেটিকে তিনি নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার দয়ার কিছু অংশ আমিও কি পেতে পারি? আমি সেই মহিলা যে আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর সত্যায়ন করছি। তিনি (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাকে স্বাগত জানাই। হিন্দ বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই ধরাপৃষ্ঠে তাঁবুতে বসবাসকারী কারো সম্পর্কেই আমি এটি কামনা করতাম না যে, তার তাঁবু বা বাসস্থান আপনার চেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হোক, কিন্তু এখন এই ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলের চেয়ে আপনার সম্মান আমার নিকট বেশি প্রিয়। হযরত হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিজের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ এভাবে করেছেন যে, তিনি দুটি ছাগলছানা ভুনা করে নিজ দাসীর হাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। সেই দাসী রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট আসে এবং নিবেদন করে, আমার গৃহকর্ত্রী এই ভুনা মাংস আপনার সমীপে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন ও ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, আজকাল আমাদের ছাগলছানার সংখ্যা কম, তাই আমি শুধুমাত্র দুটি ছানা

ভুনা করে পাঠিয়েছি। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ছাগল ও ছাগলছানাগুলোতে বরকত দান করুন। পরবর্তীতে সেই দাসী একথা বলত, আমি খোদা তা'লার নামে শপথ করে বলছি, পরবর্তীতে এত বেশি সংখ্যক ছাগল ও ছাগলছানা দেখেছি যা ইতিপূর্বে আমি দেখি নি। হযরত হিন্দ বলতেন, এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণেই হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের বয়আতের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন:

এ সেই মহিলা যে হযরত হামযার লাশ বিকৃত করিয়েছিল। তিনি (সা.) তাকে তার অন্যায় কর্মকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়াটা সমীচীন মনে করেছিলেন। সে সময় পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যখন মহিলারা বয়আত করার জন্য আসে তখন হিন্দও চাদর মুড়ি দিয়ে তাদের সাথে এসে যায় এবং সে বয়আত করে নেয়। যখন সে এই বাক্যে পৌঁছায় যে, আমরা শিরক করবো না– যেহেতু সে একজন তেজস্বী মহিলা ছিল, তাই তখন বলে ওঠে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি এখনও শিরক করব? আপনি একা ছিলেন আর আমরা পুরো শক্তি দিয়ে আপনার বিরোধিতা করেছি। আমাদের উপাস্যরা যদি সত্যই হতো তাহলে আপনি কীভাবে সফল হলেন? সেগুলো (অর্থাৎ তাদের প্রতিমাগুলো) সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা পরাজিত হয়েছি। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, তুমি কি হিন্দা? হুযূর (সা.) তার কণ্ঠস্বর চিনতেন, যেহেতু সে তাঁর (সা.) আত্মীয়া ছিল। তখন হিন্দা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি, এখন আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হেসে ফেলেন এবং বলেন, হ্যাঁ! এখন তোমাকে আটক করা সম্ভব নয়। মোটকথা, সেই জাতি যারা মনে করত, তিনি (সা.) সকল উপাস্যকে ভেঙেচুরে এক উপাস্যে পরিণত করেছেন– তাদের মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যে, হিন্দার মতো মহিলাও বলে ওঠে, একথা বলার কারো সাধ্য আছে– খোদা এক নন?

বয়আতের সেই দিনগুলোরই একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি বয়আত করার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং তাঁর প্রতাপ ও প্রভাবে ভীত হয়ে সে কাঁপতে থাকে। তিনি (সা.) তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, ভয় পেয়ো না। আর বিনয় ও নম্রতার সাথে বলেন, আমি কোনো বাদশাহ্ নই। আমি তো সেই নারীর সন্তান, যিনি মক্কায় শুকনো মাংস খেতেন।

যে-সব অপরাধীকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল– তাদের সম্পর্কে লেখা আছে; বিস্তারিত ভাবে বলছি, যদিও এ ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তির সংশয় রয়েছে এবং ঘটনাগুলোও এমনটিই সাব্যস্ত করে। কেননা যেসব কারণের ভিত্তিতে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়, সেগুলো স্পষ্টভাবে মহানবী (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি ও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। যাহোক, প্রথমে আমি এই বিষয়টি বর্ণনা করে দিচ্ছি– তারা কারা ছিল আর কিছু স্থানে কী ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; আর সেগুলোর খণ্ডনও পরবর্তীতে আমি উল্লেখ করব।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, ঐসব ব্যক্তি যাদের গুরুতর অপরাধের জন্য তিনি (সা.) বলেছেন, যেখানেই তাদের দেখা পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে– তারা ছিল আটজন পুরুষ ও ছয়জন নারী। এটি ফাতহুল বারীতে লেখা আছে। সীরাতুল হালাবিয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তারা ছিল মোট এগারোজন। ওয়াকদী লিখেছেন, এরা ছিল মোট দশজন, যাদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ এবং চারজন নারী। বুখারীর শরাহ্ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ফাতহুল বারীতে এ চৌদ্দজনের নামও লিখিত রয়েছে যাদের মধ্যে আব্দুল উযযা বিন খাতাল, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্, ইকরামা বিন আবি জাহল, মিকয়াস বিন সুবাবা, হাব্বার বিন আসওয়াদ প্রমুখ নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন চারজন পুরুষ এবং

দুইজন নারী ব্যতীত সবাইকে নিরাপত্তা দান করেন। তিনি (সা.) বলেন, তারা যদি কা'বার পর্দা ধরেও ঝুলে থাকে তবুও তাদের হত্যা করো। একটি বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন এ চারজন ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন; এই চার ব্যক্তি ছাড়া, অর্থাৎ আব্দুল উযযা বিন খাতাল, মিকয়াস বিন খুবাবা (সুবাবা), আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ এবং উম্মে সারাহ্ ছিল। একজন জীবনীকার লিখেছেন, যেসব ব্যক্তিকে হত্যার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই মহানবী (সা.) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং অল্প কয়েকজন নিহত হয়েছিল, যাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পূর্বেই হত্যা করা হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে নিজের যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা হলো: কেবল এগারোজন পুরুষ এবং চারজন নারী এরূপ ছিল যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধ প্রমাণিত ছিল। তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল এবং তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ ছিল, তাদেরকে যেন হত্যা করা হয়। কেননা তারা শুধু কুফর বা লড়াইয়ের অপরাধে অপরাধী ছিল না, বরং তারা গুরুতর যুদ্ধাপরাধী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই তিনি (সা.) মুসলমানদের সুপারিশে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) মক্কাবাসী এবং অন্যান্য লোকদের বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় লাভের পর এবং তাদেরকে স্বীয় তরবারির নীচে পেয়েও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন এবং শুধুমাত্র এমন কতিপয় লোককে শাস্তি দেন যাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আদেশ জারি হয়েছিল; [অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন]। আর সেই কয়েকজন চির-অভিশপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকি সব শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

যে-সব ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল, ইতিহাসে তাদেরকে হত্যার কারণসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক, আমি তা বর্ণনা করে দিচ্ছি, কিন্তু বর্ণিত সেই কারণগুলো সন্তোষজনক নয়। (ইতিহাসে) লেখা আছে, প্রথম ব্যক্তি যাকে হত্যা করা হয় সে হলো আব্দুল উযযা বিন খাতাল। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মহানবী (সা.) তার নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। সে মদীনায় হিজরত করেছিল। তিনি (সা.) তাকে যাকাত আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে বনু খুযাআ' গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার জন্য খাবার রান্না করত এবং তার সেবা করত। তারা দুইজন এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে যেখানে একত্রিত হয়ে লোকেরা যাকাত দিয়ে যেত। ইবনে খাতাল সেই খুযায়ী ব্যক্তিকে খাবার রান্না করার আদেশ দেয় আর নিজে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম থেকে জেগে দেখে, খুযায়ী লোকটি ঘুমিয়ে আছে এবং সে কিছুই রান্না করে নি। ইবনে খাতাল তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করে এবং ইসলাম পরিত্যাগ করে (তথা মুরতাদ হয়ে) মক্কায় পালিয়ে যায়। সে কবিতার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। তিনি তা খুলে রাখেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে, ইবনে খাতাল কা'বা গৃহের পর্দা ধরে ঝুলে আছে। তিনি (সা.) বললেন, তাকে হত্যা করো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো মিকইয়াস বিন সুবাবা। সে একজন আনসারী সাহাবীকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উক্ত আনসারী সাহাবী একটি যুদ্ধে মিকইয়াসের ভাইকে শত্রু

মনে করে হত্যা করে ফেলেছিল। মিকইয়াস নিহত ভাইয়ের রক্তপণও নেয় এবং আনসারী সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে মক্কায় ফেরত চলে যায়। হযরত নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্ মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করেন।

আরেকজন হলো হুয়াইরাস বিন নুকায়েয। মহানবী (সা.) তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ফরমান জারি করেছিলেন বলে লেখা আছে। কথিত আছে, সে মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

একজন সীরাত প্রণেতা লেখেন, হুয়াইরাস বিন নুকায়েযকে হত্যা করার কারণ এটাই পাওয়া যায় যে, সে মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত। বাস্তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার কারণ অন্য কিছু। কারণ মহানবী (সা.) নিজ সত্তার জন্য কোনো প্রতিশোধ নিতেন না।

এর পরেরজন হলো হুয়াইরিস বিন তালাতিল খুযায়ী। সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত। তাকেও হযরত আলী (রা.) হত্যা করেছিলেন।

এরপর ইবনে খাতাল-এর ক্রীতদাসী কারিনা। তাকে আরনাব নামেও ডাকা হতো। সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কবিতা লিখে কুৎসা রটনা করত; তাকেও হত্যা করা হয়।

মোটকথা, যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তাদের সংখ্যা চৌদ্দ বা পনেরোজন। কিন্তু গবেষণা করলে এ সংখ্যা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কেননা যে-সব অপরাধের কারণে তাদেরকে হত্যা করার কথা উল্লেখ হয়েছে, সেসব আরোপিত অপরাধই বলে দেয়, ইতিহাসবিদদের ভুল হয়েছে। অধিকাংশের অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল অথবা তারা মহানবী (সা.)-কে দুঃখকষ্ট দিত অথবা তাঁর নামে কুৎসা রটনা করে বেড়াত। এসব আরোপিত অপরাধ বলে দিচ্ছে, এসব পরবর্তী যুগের চিন্তাধারা, যখন কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের বিপরীতে গিয়ে এমন চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়েছে যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং রসূল অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এগুলো পরবর্তী সময়ের চিন্তাধারা; মহানবী (সা.)-এর যুগে তো এসব হয় নি। যেক্ষেত্রে কুরআন দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুরতাদ হবার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়; যেক্ষেত্রে কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়া, দুঃখ দেওয়া বা তাঁর নামে কুৎসা রটনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়, সেক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়– মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে– তাদের অপরাধ নিশ্চয় ভিন্ন কিছু ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেমনটি লিখেছেন, তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল অথবা গুপ্ত ঘাতকও হতে পারে; এসব অপরাধ তাদের ছিল। কিন্তু তারা কুৎসা রটনাকারী অথবা অবমাননাকারী ছিল (বলে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে)– একথা সঠিক নয়।

মক্কা বিজয়ের সময় হত্যা করার এসব রেওয়ায়েতের সমালোচনা করে উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত জীবনীকার আল্লামা শিবলী নোমানী লেখেন, জীবনী রচায়িতাগণ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যদিও মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন, তথাপি দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে এ নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন– তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই যেন হত্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ এদের মাঝে কয়েকজন আব্দুল্লাহ্ বিন খাতাল, মিকইয়াস বিন সুবাবা ছিল খুনের অপরাধী এবং কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ তাদের হত্যা করা হয়। [এ দুইজন ঘাতক ছিল, তাই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে; যদি বিষয়টি মেনেও নেওয়া হয়– তবে।] কিন্তু এমন আরো কয়েকজন ছিল যাদের অপরাধ শুধু এটুকুই ছিল যে, তারা মক্কায় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত অথবা তাঁকে (সা.) অবমাননা করে ব্যঙ্গকাব্য পাঠ করত। [মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত অথবা অবমাননাকর ব্যঙ্গকাব্য পাঠ করত।] কথিত আছে, এদের মাঝে একজন মহিলাকে এ অপরাধে হত্যা করা হয়েছে যে, সে মহানবী (সা.)-এর জন্য অবমাননাকর ব্যঙ্গকাব্য পাঠ করত। কিন্তু

তিনি লিখেছেন, হাদীস যাচাইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী এ বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ এ অপরাধে তো সব মক্কাবাসীই অপরাধী ছিল। এ কথাই যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কষ্ট দিত ও অবমাননাকর ব্যঙ্গকাব্য পাঠ করত, তাহলে তো সব মক্কাবাসীই এই একই কাজ করত; সেক্ষেত্রে তো সবাইকেই হত্যা করা উচিত ছিল। কুরাইশের মাঝ থেকে দু-একজন ব্যতিরেকে আর কে ছিল, যে মহানবী (সা.)-কে অবর্ণনীয় কষ্ট দেয় নি? এতদসত্ত্বেও এসব লোককেই এ সুসংবাদ শোনানো হয়েছিল– أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ অর্থাৎ তোমরা স্বাধীন। যাদেরকে হত্যা করার বর্ণনা পাওয়া যায়, তারা এই অপরাধে তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের অপরাধী ছিল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-র এ রেওয়ায়েত সিহাহ সিত্তাহতে সংরক্ষিত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) কারো প্রতি কোনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। যে ইহুদী মহিলা খায়বারে মহানবী (সা.)-কে বিষ দিয়েছে, তার সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞেসও করেছে– 'তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে কি?' নির্দেশনা আসে– 'না'। খায়বারের ন্যায় অবিশ্বাসীদের স্থানেও একজন ইহুদী মহিলা যদি বিষ দেওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববাসীর জন্য রহমত তথা মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে প্রাণে বেঁচে যেতে পারে, তবে হারাম শরীফে তার চেয়ে নিম্নস্তরের অপরাধী মহানবী (সা.)-এর বদান্যতা থেকে কীভাবে বঞ্চিত থাকতে পারে? যদি দিরায়াত (তথা বর্ণনার যৌক্তিকতা) নিয়ে কেউ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না-ও হয়, তথাপি রেওয়ায়েত অনুসারেও কিন্তু এ ঘটনা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য বলে পরিগণিত হয় না। [যদি বিবেকবুদ্ধি দিয়ে চিন্তা না-ও করা হয়, তবুও রেওয়ায়েতও ভুল।] কেননা সহীহ্ বুখারীতে কেবলমাত্র ইবনে খাতালকে হত্যা করার উল্লেখ রয়েছে আর এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত, তাকে কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করা হয়েছিল। মিকইয়াসের হত্যাও শরীয়তগতভাবে কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ ছিল। অন্য যাদের সম্পর্কে হত্যার নির্দেশের কারণ সম্পর্কিত বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তারা কোনো এক সময় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত– সেসমস্ত রেওয়ায়েত শুধুমাত্র ইবনে ইসহাক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়; অর্থাৎ হাদীসের নীতি অনুযায়ী সেসব রেওয়ায়েত মুনকাতা' তথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য রেওয়ায়েত যেটি উপস্থাপন করা যায় সেটি হচ্ছে আবু দাউদের রেওয়ায়েত, যার মাঝে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, চার ব্যক্তিকে কখনো নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। আবু দাউদ এ হাদীস সংকলন করে লিখেছেন, এ রেওয়ায়েতের সনদ যেরূপ প্রয়োজন ছিল– তা আমি পাই নি। আবু দাউদের এ-সকল রেওয়ায়েত সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও লেখা হয়েছে, সেগুলো দুর্বল। নিঃসন্দেহে কতিপয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, যারা ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল, তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ইবনে ইসহাকের ধারণা যে, তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেবার দরুন তারা পলায়ন করেছিল। মোটকথা, মক্কা বিজয়ের সময় শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আর এরা তারাই ছিল, যাদের সম্পর্কে হাকাম ও আদল (ন্যায় মীমাংসাকারী ও বিচারক) হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শুধুমাত্র সেই কয়েকজন লোককে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল যাদের শাস্তি প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিশ্চিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ তারা ছিল কেবল তিন-চারজন; আর এদের ন্যায় চির-অভিশপ্ত ব্যতিরেকে প্রত্যেক শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

অতএব এটাই প্রকৃত সত্য। এজন্য যদি একথা বলা হয় যে, এতজন ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণ ছিল ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা বা রসূল অবমাননা করা– এগুলো সবই ভুল কথা। অবশিষ্টাংশ পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্বের পরিস্থিতি তো আপনাদের জানাই আছে। সর্বদা দোয়া করতে থাকুন; এর আগেও আমি বহুবার এটি বলেছি এবং প্রায়ই স্মরণ করিয়ে থাকি। জরুরি পরিস্থিতির জন্য যে বিষয়টি আমি বার বার স্মরণ করিয়েছি, পূর্বেও কয়েকবার বলেছি; জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদের উচিত বাড়িতে কয়েক মাসের খাদ্যসামগ্রী মজুদ রাখা। এখন তো কিছু দেশের সরকারও তাদের নাগরিকদের বলছে, কমপক্ষে তিন মাসের খাবার ঘরে রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর প্রতি দয়া করুন এবং আমাদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন।

আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। তাদের মাঝে প্রথমজন হলেন আমাতুন নাসীম নিগহাত সাহেবা– যিনি রাজা আব্দুল মালেক সাহেবের স্ত্রী। তিনি কিছুদিন পূর্বে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-র পৌত্রি ছিলেন। হযরত নওয়াব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার (রা.) দৌহিত্রি ছিলেন। কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। আমেরিকাতেও এক দীর্ঘ সময় বসবাস করেন। সেখানেও তিনি প্রায় দশ বছর লাজনার সেক্রেটারি মাল এবং সেক্রেটারি যিয়াফত হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার মেয়ে আমিনা বলেন, তিনি নিয়মিত সদকা প্রদান করতেন, নীরবে প্রদান করতেন এবং কিছুদিন পর পর নিয়মিতভাবে তিনি গরিবদের মাঝে সদকা বণ্টন করতেন। আর্থিকভাবেও সাহায্য প্রদান করতেন। গরিবদের বাড়ি নির্মাণ করে দিতেন।

তিনি বলেন, একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, নিজের চুড়ি খুলে আপন খালাকে দিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের চুড়ি খুলে তাকে দিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অভাবীদেরকে প্রচুর সাহায্য করতেন। গভীর সহানুভূতি ছিল তার মাঝে। তিনি বলেন, হাস্যরসিক ছিলেন বিধায় মানুষ (গভীরভাবে) চিনত না; কিন্তু আমি তাকে দেখেছি, তিনি রাতে এত আহাজারি করে দোয়া করতেন যে, মেঝেও কেঁপে উঠত। আর অতিথিপরায়ণতা ছিল তার বিশেষ গুণ। তিনি বলেন, আমরা যিকরে এলাহী করার নিয়ম মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। সর্বদা দরূদ শরীফ পড়তেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযমের পঙ্‌ক্তি পড়তে থাকতেন। আমরা এতবার শুনেছি যে, আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে।

তার মেয়ে আয়েশা লেখেন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতেন।

তার ভাগ্নে লেখেন, তিনি অত্যন্ত নীরবে দান করতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাকে কখনো কখনো কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করার কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'লা একবার জানিয়ে দেন, অমুকের সন্তানের বিয়ে, তাকে সাহায্য করো। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে এক লাখ রুপি পাঠিয়ে দেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযায় যার স্মৃতিচারণ তিনি হলেন মুকাররম আলহাজ্জ ইয়াকূব আহমদ বিন আবু বকর সাহেব। ইনি আহমদীয়া সিনিয়র হাই স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার এবং ঘানা জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে একটি দুর্ঘটনায় ৬৩ বছর

বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মূসী ছিলেন। সেখানকার মানকাসাম নামক শহরে যাবার পথে একটি ট্রলারের সাথে তার গাড়ির সংঘর্ষ হয় এবং সেখানে তিনি মাথায় আঘাত পান। এ কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার উত্তরসূরিদের মাঝে দুই স্ত্রী, চার সন্তান, মা, এক বোন এবং এক ভাই রয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর সল্টপন্ড-এ অবস্থিত আহমদীয়া মিশনারি ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পাশ করার পর তিনি জামা'তের সেবায় বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হন। পরে জামা'তের পক্ষ থেকে তাকে ইউনিভার্সিটি অব ঘানায় ভর্তি করানো হয়, যেখানে তিনি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে ডিগ্রি লাভ করার পর সরকারি চাকরির প্রস্তাব পান, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা তিনি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন এবং সর্বদা ওয়াকফের মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করেছেন। যদিও পরে তিনি সরকারি স্কুলে নিযুক্ত হন; সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত হলেও সেই স্কুলটি জামা'তেরই ছিল; শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করার পর তিনি সেখানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সালাগা এবং কুমাসির আহমদী স্কুলসমূহে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানকার সাধারণ মানুষ, ব্যবস্থাপনা পরিষদ, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরাও তাকে সর্বদা স্মরণ করেন।

যেভাবে আমি বলেছি, তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কায়েদ তরবিয়ত হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শিক্ষা অধিদপ্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি ঘানার 'চাস' (CHASS: Conference of Heads of Assisted Secondary School)-এর কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং 'নাস্ট' (KNUST: Kwame Nkrumah University of Science and Technology)-এর কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এছাড়া 'ডিটিইসি' (DTEC: Ghana Tertiary Education Commission)-এর বোর্ড সদস্য ছিলেন। 'ডাব্লিউএইসি' (WAEC: West African Examination Council)-এর বোর্ড সদস্য ছিলেন। 'এসিপি' (ACP: African Confederation of Principals)-এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান প্রিন্সিপাল অ্যাসোসিয়েশন তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে আর লেখে, তিনি নীতিবান মানুষ ছিলেন এবং তার নেতৃত্ব অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল।

তিনি সর্বদা বলতেন, আমার সফলতার মূল কেন্দ্র ছিল ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পর্ক। তিনি ছিলেন একজন স্নেহপরায়ণ স্বামী এবং পিতা। পরিবারের জন্য ঈমান, নিয়মশৃঙ্খলা ও ভালোবাসার প্রতীক ছিলেন। রমযানে পবিত্র কুরআন একাধিকবার পড়ে শেষ করতেন। ইবাদতের প্রতি সর্বদা পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তার স্বভাবে একদিকে যেমন নেতৃত্বদানের পরম যোগ্যতা ছিল, তদ্রূপ বিনয়ও ছিল এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতেন।

তার বড়ো ভাই প্রথমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তারপর তার পরিবারে আহমদীয়াত আসে; একথা তার ভাই আবু বকর সাঈদ লিখেছেন। এরপর তার পিতা তাকে সল্টপন্ড মিশনারি ট্রেনিং কলেজে পাঠান, যেখানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং লোকাল মিশনারি হিসেবে নিযুক্ত হন। ধীরে ধীরে উন্নতি করে তিনি জামা'তী এবং সরকারি উভয় স্তরে নিজ কর্মক্ষেত্রে সম্মানজনক স্থান অর্জন করেছিলেন।

ঘানায় অবস্থানকালে আমার সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। গুরুত্বপূর্ণ যে কাজই হতো, এমন সব কাজ যেখানে বিশ্বাস ও আস্থার প্রয়োজন হতো– সেগুলো আমি তাকে দিয়েই করাতাম। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খলীফা হবার পরে তো তার সাথে আমার এমন এক সম্পর্ক হয়েছিল যা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার চরম মাত্রায় গিয়ে ঠেকেছিল। জামা'ত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর আত্মাভিমান প্রদর্শনকারী ছিলেন।

তার মা বলেন, সে আমার সবচেয়ে বাধ্য সন্তান ছিল। শৈশবকাল থেকেই সে আমার দেখাশোনা করত। সে নিজে হজ্জ করার নিয়্যত করে, কিন্তু এর পূর্বে সে আমাকে বলে, আপনি হজ্জ করুন; আর মাকে প্রথমে হজ্জ করান, তারপর নিজে হজ্জ করেন। তিনি বলেন, কখনো আমাকে একা ছেড়ে দেয় নি, সর্বদা আমাকে সঙ্গে রেখেছে।

তার সহধর্মিণী বলেন, তিনি একজন প্রেমময় ও দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন। সন্তানদের জন্য একজন স্নেহশীল পিতা ছিলেন এবং সবসময় উপদেশ দিতেন– জামা'তের জন্য কুরবানী করা উচিত।

তার পুত্র লেখেন, তিনি সর্বদা আমাদের ঈমান ও আহমদীয়াতকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি (আমাদেরকে) ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকার গুরুত্ব শিখিয়েছেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আরো লেখেন, তার ঈমান আমাদের পুরো বংশের জন্য আলোকবর্তিকা। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের জন্য আমাদেরকে জাগাতেন এবং রমযানে বিশেষভাবে এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তিনি বলেন, তার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান করতেন, তা তারা তার অধীনস্থই হোক না কেন। অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল মানুষ ছিলেন।

তার ভাই সাঈদ বিন আবু বকর বলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি আমার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন প্রকৃত পিতার মতো তিনি আমায় লালনপালন করেছেন, আমার খেয়াল রেখেছেন, আমার তরবিয়ত করেছেন, নামাযের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার মতো বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক ও পুণ্যকর্মে অগ্রগামী করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)